Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ

Volume	7
Issue	1
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল করিম
Published online	June 15, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.3
Pages	81-102
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ

আবদুল করিম

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলা দেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে আরম্ভ করে এদেশে মুসলমানদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালে মুসলমানরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, যার ফলে বাংলা দেশের বৃহদাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করেছে। কিন্তু বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পূর্বেও বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। এই প্রাথমিক আমলের যোগাযোগের স্বরূপ ও ধারা নির্ণয় করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যেসব সূত্রের উপর নির্ভর করে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাকে মোটামুটীভাবে কয়েকটী ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরবীয় মুসলমান ভৌগোলিকদের বিবরণ এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত আখ্যানসমূহ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়-পুরে এবং ত্রিপুরা জেলার ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলীফাদের একটী করে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে যে মুদ্রাটী আবিষ্কৃত হয়, তা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে খলীফা হারুণ অর রশীদ কর্তৃক মোহাম্মদীয়া টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল।[১] ময়নামতীতে আবিষ্কৃত মুদ্রাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কারণ পাকিস্তান প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এযাবৎ খননকার্য সম্পূর্ণ করেন নি এবং প্রথম খননের ৮ বৎসরের মধ্যেও ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া খননকার্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন নি। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর নির্ভর করে ডঃ এনামুল হক সাহেব

১। কে, এন, দীক্ষিত: মেময়রস অব দি আরকেঅলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (*Memoirs of The Archaeological Survey of India*) নং ৫৫, পৃ ৮৭

বলেন, "...হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব-পারস্যের মুসলিম-সাধক ও ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ কোন ইসলাম-প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারে খলীফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ, যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার করিতে গমন করেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল। যেরূপেই হউক, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত খলীফার এই মুদ্রাটি অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে।"[১] ডঃ হক মনে করেন যে এই মুদ্রা ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র ধরে আসেনি, কারণ তাঁর মতে, পাহাড়পুর তখন ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র ছিল না।[২] তিনি আরও মনে করেন যে এই মুদ্রা অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যেই পাহাড়পুরে নীত হয়, কারণ "খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।"[৩]

নানা কারণে ডঃ হকের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু মুদ্রাটি খলিফা হারুন অর রশীদ কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল, সেহেতু এই মুদ্রা খলীফার জীবদ্দশায় বা তাঁর খেলাফতের শত বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে আনীত হয়েছিল, তা মনে করার কোন যথার্থ কারণ নাই। এখনও দেখা যায় যে বাংলা দেশের অনেক লোক মুসলমানী আমলের সিক্কা টাকা কবচ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলা দেশ বিজয়ের পরে যে এই মুদ্রা আনীত হয়নি, একথা জোর করে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পাহাড়পুর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না থাকুক, সমুদ্র-উপকূলবর্তী ব্যবসার কেন্দ্রস্থল থেকে এই মুদ্রা আভ্যন্তরীণ জন-সমাবেশে নীত হওয়া অসম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কোন মুসলমান সাধক ও ধর্মপ্রচারক বাংলা দেশে এসেছিলেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। চতুর্থতঃ, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পাহাড়পুরের মুদ্রাটি ধ্বংসস্তূপের মাটির উপরিভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে; খননকৃত

১। ডঃ এনামুল হক : পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পৃ ১২

২। ঐ

৩। ঐ

বৌদ্ধ বিহারের কোন নিম্নস্তরে পাওয়া যায়নি।[১] সহজেই বুঝা যায় যে, মুদ্রাটি বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংসের পরেই পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপে নীত হয়; মুদ্রাটি বাংলাদেশে কবে কিভাবে প্রবেশ করেছিল, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও এ মুদ্রাটি তেমন সাহায্য করে না।

আরবীয় মুসলমান ভৌগোলিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যপথ বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। এই সব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মানের নাম সবার আগে উল্লেখযোগ্য। সোলায়মানের 'সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখ' রচিত হয়েছিল ৮৫১ খৃঃ বা তৎনিকটবর্তী সময়ে।[২] সোলায়মানের পর আরও কয়েকজন ভৌগোলিক এ বিষয়ে তাঁদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সকলেই সোলায়মানের কাছে ঋণী; কারণ তাঁদের বর্ণনা মোটামুটিভাবে সোলায়মানের 'সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখে'র উপর নির্ভরশীল। ইবন্ খুরদাদবা (মৃত্যু ৯১২ খৃঃ) তাঁর 'কিতাব-উল-মসালিক-আল-মমালিক'-এ সবার আগে আরব দেশ থেকে সুদূর চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যপথ বর্ণনা করেছেন। আল-ইদ্রিসী (জন্ম একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে) এবং আল-মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬ খৃঃ)ও ইবন খুরদাদবার অনুসরণে বানিজ্যপথের বর্ণনা দিয়াছেন। ঐ সময় ছিল আরবীয় মুসলমান বণিকদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ, বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপত্তিস্থল, মূল্যমান ও আমদানী-রপ্তানী বিষয়ক খুঁটিনাটি আরবীয় মুসলমানদের গবেষণার বস্তু ছিল। এই কারণেই আরবীয় ভৌগোলিকদের এই প্রচেষ্টা দেখা দেয় (পরবর্তীকালে, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ গবেষণা চালানো হত)। কিন্তু এসব ভৌগোলিকেরা কেউ এ দেশে এসেছিলেন বলে মনে হয় না। এলিয়ট মনে করেন যে সোলায়মান কয়েকবার তাঁর বর্ণিত দেশসমূহ সফর করেছিলেন এবং তথ্য অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ হোসাইন নাইনারের মতে 'সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখ' কোন একজনের দ্বারা লিখিত হয়

১। কে, এন, দীক্ষিত: প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

২। এলিয়ট ও ডউসন: হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিষ্টরিয়ানস, খণ্ড ১, পৃ ২

৩। ঐ, পৃ ২

নাই ; অনেকের সংগৃহীত তথ্যসমূহ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১] সোলায়মানের বর্ণনা (যা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করলে মনে হয়, আর যাই হোক না কেন, বর্ণিত দেশের সাথে সোলায়মানের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। ইব্‌ন খুরদাদবাও তাঁর বর্ণিত দেশসমূহ সফর করেন নি, তবে তাঁর প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ছিল না। আব্বাসীয় খলিফাদের ডাক ও পুলিশ বিভাগের কর্তা হিসাবে সরকারী দফতরে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজে তাঁর প্রবেশাধিকার (access) ছিল এবং পূর্ববর্তী পুস্তকসমূহও তাঁর আয়ত্বাধীনে ছিল। আল-ইদ্রিসী ও আল-মাসুদী প্রমুখ পরবর্তী লেখক তাঁদের পূর্ববর্তীদের অনুগমন করেছেন মাত্র।

আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে দুই রকমের তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাঁরা এমন এক দেশের বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে আধুনিক গবেষকেরা বাংলা দেশের সাথে অভিন্ন মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা এমন কতকগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্রের নাম করেছেন, যাকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বাণিজ্য-কেন্দ্রের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়। সোলায়মানের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"এই তিনটি রাজ্য [জুর্জ, বলহার ও তফক] রুহ্‌মী [Ruhmi رهمى] নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, যা [রুহ্‌মী] জুর্জ, রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। রাজা খুব সমাদৃত নয়। জুর্জের সঙ্গে যেমন তিনি যুদ্ধে লিপ্ত, তেমনি বলহারের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। জুর্জ, বলহার ও তফক-এর চাইতে তাঁর অনেক বেশী সৈন্য-সামন্ত আছে। কথিত আছে যে, তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, পঞ্চাশ হাজার হাতী তাঁর অনুবর্তী হয়। তিনি শুধু শীত কালেই যুদ্ধ যাত্রা করেন, কারণ হাতী পিপাসা সহ্য করতে পারে না এবং শুধু শীত কালেই যুদ্ধ করতে পারে। কথিত আছে যে, তাঁর সেনাদলে দশ পনের হাজার লোক শুধু কাপড় তৈরী ও ধোলাইয়ের কাজে নিযুক্ত থাকে। তাঁর দেশে এমন এক রকম বস্ত্র তৈরী হয় যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই বস্ত্র এতই মিহি ও সূক্ষ্ম যে এর দ্বারা তৈরী একটি পোষাক একটা

১। মোহাম্মদ হোসাইন নাইনার : আরাব জিওগ্রাফারস্ নলেজ অব সাদার্ণ ইণ্ডিয়া (*Arab Geographer's Knowledge of Southern India*), পৃ ৭—১২

অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়ে [অনায়াসে নাড়াচাড়া] করা যায়। এটা সুতার তৈরী এবং আমরা এর একখণ্ড দেখেছি। এই দেশে কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা চালান হয় এবং কড়িই তার প্রচলিত মুদ্রা। তাদের সোনা, রূপা ও চন্দন কাঠ আছে এবং সমারা [সোমরস ?] নামে একটি জিনিষ আছে যার দ্বারা মাদব [মাদক ?] তৈরী হয়। ডোরাকাটা [striped] ভূষণ বা কারকদম এই দেশে পাওয়া যায়। এই জন্তুটির কপালের মাঝখানে একটি মাত্র শিং আছে এবং শিংয়ে মানুষের প্রতিকৃতির মত একটি আকৃতি দেখা যায়।"[১]

পরবর্তী লেখকরাও একই রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন, সুতরাং পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রাজার উপাধি সম্পর্কীয় উক্তিগুলি এখানে উদ্ধৃতি করছি। আল মাসুদীর মতে "এই দেশের [তফন = তফক] অপর প্রান্তে রাহ্‌মা নামক রাজ্য অবস্থিত; রাহ্‌মা তাদের রাজার উপাধি এবং সাধারণতঃ তাদের রাজার নামও বটে।"[২] মাসুদীর এই উক্তির সমর্থনে এবং ইব্‌ন খুরদাদবার অনুসরণে আল ইদ্রিসী বলেন, "রাজারা সাধারণতঃ বংশানুগত [hereditary] উপাধি গ্রহণ করেন। যেমন, চীন দেশের রাজারা শতাব্দী কাল ধরে বাগবুঘ (বা বাগবুন) উপাধিতে ভূষিত এবং এই উপাধি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। ভারতবর্ষীয় রাজাদের মধ্যে বলহার, জাব, কাফির, হাজর [জুজর], আবত, তুমী (রূহ্‌মী) এবং কামরুন [উপাধি আছে]। এই উপাধিগুলি শুধু ঐ সব রাজপুত্ররাই ধারণ করে, যারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়; অন্য কারও এসব উপাধি ধারণ করার অধিকার নাই।"[৩]

সোলায়মান-বর্ণিত রূহ্‌মী রাজ্য নির্দেশ (identify) করার জন্য আধুনিক কালের পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক তথ্য খুঁজে বের করেছেন এবং অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হোদিওয়ালাই সর্বপ্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 'ধর্‌হ্‌মী' শব্দ ভুলবশতঃ রুহ্‌মী [মাসুদীর 'রাহমা'] লেখা হয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে 'রূহ্‌মী' রাজ্য পালবংশীয়

১। এলিয়ট ও ডওসন : প্রাগুক্ত, পৃ ৫

২। ঐ, পৃ ২৫

৩। ঐ, পৃ ৮৬

রাজা ধর্মপালের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।[১] বর্তমান কালে পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য নাই যে, পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের সময় খ্রীষ্টীয় ৭৭০ থেকে ৮১০ সালের মধ্যে।[২] এই সূত্রে ধর্মপালকে সোলায়মানের 'সিলসিলাত-উত-তত্তয়ারীখে'র সমসাময়িক ধরা যায় এবং রূহ্মী রাজ্য ধর্মপালের রাজ্য বলে নির্দেশ করা যায়।

হোদিওয়ালার পরবর্তী গবেষকরা তাঁর উপরোক্ত যুক্তিকে জোরদার করার জন্য আরও তথ্য সরবরাহ করেছেন। যেমন তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারনাথের অনুসরণে এস. সি, দাশ বলেন, "পুরাকালের চাটিগ্রাম বাংলা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল। ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং রখন (আরাকান)-এর উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ রম্ম (সংস্কৃত রম্য) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপূর ছিল। নালন্দার পতনের পরে তা বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। চাটিগ্রাম শহরে পণ্ডিত বিহার নামে একটী বৃহদাকার বৌদ্ধ বিহার ছিল।"[৩] এস, সি, দাশের এই উক্তির উপর নির্ভর করে অনেকেই মনে করেন রম্ম আরব ভৌগোলিকদের 'রূহ্মী'র সঙ্গে অভিন্ন।[৪] যদিও আক্ষরিক অর্থে এস, সি, দাশের দ্বিতীয় বাক্যে রম্ম বা রম্য ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যবর্তী একটা ভূভাগের নাম বুঝায়, তার পরবর্তী বাক্যদ্বয় পড়লে মনে হয়, রম্য শব্দটী চাটিগ্রামেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এই রম্যকে আরব ভৌগোলিকদের 'রূহ্মী'-র সঙ্গে অভিন্ন মনে করা পুরাপুরী যুক্তিসঙ্গত নয়। পরবর্তী কালের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণে রামু নামক একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে আগত রাল্ফ ফিচ্-এর মতে আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে রামু নামক একটি রাজ্য ছিল এবং চট্টগ্রাম, রামু ও আরাকান এই তিন স্থানই আরাকান রাজের অধিকারে ছিল।[৫] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আগত সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক দিয়াঙ থেকে

১। হোদিওয়ালা: ষ্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিষ্টরি, পৃ ৪
২। হিষ্টরি অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ১৭৬
৩। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৮, পৃ ২৪
৪। ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড ১৬, পৃ ২৩২-৩৪
৫। উইলিয়ম ফষ্টার সম্পাদিত, আর্লি ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া, পৃ ২৬

আরাকান যাওয়ার পথে রামুতে অবস্থান করেছিলেন। তখন রামুতে আরাকান রাজের অধীনস্থ এক প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাস করতেন।[১] রামুর অবস্থান নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। রামু নামক একটি থানা এখনও চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে বিদ্যমান। বর্তমান রামু থানার সদর এলাকার অনতিদূরে রামকোট নামক স্থানে এখনও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।[২] ম্যানরিক-প্রদত্ত দিয়াঙ থেকে আরাকান যাওয়ার পথের বিবরণ-অবলম্বনেও বর্তমান রামু থানার সঙ্গে ম্যানরিক ও ফিচ্ বর্ণিত রামু রাজ্যের অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক, এই রামু, তারনাথের রম্ম (বা রম্য) এবং আরব ভৌগোলিকদের রূহ্মী (বা রাহ্মা)কে অভিন্ন মনে করেন। এই সূত্র অবলম্বনে এঁরা পাল রাজবংশের উৎপত্তি রামু অঞ্চলেই নির্দেশ করেন। যেহেতু রামু সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত, এই সব ঐতিহাসিকরা, পাল রাজাদের শিলালিপিতে বর্ণিত তাদের 'সমুদ্রকূল-উদ্ভূত' আখ্যারও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন।[৩]

নামের দিক দিয়ে বিচার করলে রূহ্মী, রম্ম ও রামু শব্দত্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে বৈ কি! কিন্তু মনে হয় আধুনিক পণ্ডিতেরা নামের সামঞ্জস্যের মোহে পড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এমন কোন শক্তিশালী রাজা—যিনি একই সঙ্গে জুর্জ ও বলহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, যার অধীনে পঞ্চাশ হাজার হাতী ছিল এবং যার সেনাদলে ১০।৯৫ হাজার লোক শুধু ধোলাই কাজে নিযুক্ত ছিল—আদৌ রামু রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নাই। রামু বা দক্ষিণ চট্টগ্রামে পাল রাজাদের আধিপত্য ছিল কিনা তাও সন্দেহের ব্যাপার। পালবংশীয় শিলালিপির মধ্যে বর্তমান ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামের পূর্ব দক্ষিণে পাল রাজাদের কোন শিলালিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং রূহ্মীর সঙ্গে রামুর অভিন্নতা প্রমাণ করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং রামুকে এই আলোচনায় টেনে আনায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে বলেই মনে হয়।

১। ট্রাভেলস্ অব সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক, খণ্ড ১, পৃ ৯৪

২। এই স্থান থেকে প্রাপ্ত একটি সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানী মুদ্রা আমার কাছে আছে এবং আর একটি মুদ্রা আমি জার্ণাল অব দি নুমিজমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার ২২শ খণ্ডে প্রকাশ করেছি।

৩। ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড ১৬, পৃ ২৩২-২৩৪।

রূহ্‌মীর অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, আরব ভৌগোলিকদের রূহ্‌মী-সম্পর্কীয় বিবরণ যে বাংলা দেশের উপর প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। হাতী, অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম সূতী কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে অভিন্ন), গণ্ডার (পরবর্তী ইউরোপীয় বাণিকদের বর্ণিত ইউনিকর্‌ণ), এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচলিত কড়ি ইত্যাদি সকল সূত্রই বাংলা দেশকে নির্দেশ করে। পরবর্তী পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের [যেমন, ইব্‌ন বতুতা, মিনহাজ-উদ-দীন সিরাজের 'তবকাত-ই নাসিরী' এবং টমাস বউরীর বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ (Countries Round the Bay of Bengal)] বর্ণনায়ও বাংলা দেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে ওঠে। এক জায়গায় মাসুদী বলেছেন যে, "রূহ্‌মী রাজ্য সমুদ্র ও অন্তবর্তী ভূভাগ উভয় দিকেই বিস্তৃত ছিল। অন্তর্বর্তী ভূভাগের দিকে কামন রাজ্য এর সীমান্তে অবস্থিত।[১] কামনকে কামরূপের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।[২] এবং এই সূত্রে রূহ্‌মীকে বাংলার সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করে। এখন প্রশ্ন হয়, সোলায়মান যদি বাংলা দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকেন, তাহলে তাঁর বর্ণিত রাজাকে কার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়? সোলায়মানের অন্যান্য সূত্রে তার সন্ধান মিলে। সোলায়মান বর্ণিত জুর্জ, গুর্জর প্রতিহার রাজাদের বুঝায় এবং বলহার দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা বল্লভ রায়কে নির্দেশ করে।[৩] এই দুই দেশের সঙ্গে পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের যে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল, সমসাময়িক শিলালিপি তা সাক্ষ্য দেয়।[৪] আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মপালের সময় ও সোলায়মানের সময়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই অর্থাৎ তাঁরা সমসাময়িক। এইসব সূত্র বিচার করলে মনে হয়, এতদ্বিষয়ে হোদি-ওয়ালার মতই যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ রাজা ধর্মপাল (ملک الرهمی) সোলায়মানের 'সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখে' রূহ্‌মী রাজে (ملک الروهمی) পরিণত হয়েছে। আল ইদ্রিসীর সাক্ষ্যমত এও হতে পারে যে, ধর্‌হ্‌মী (বা রূহ্‌মী)

১। এলিয়ট ও ডউসন: প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

২। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরি কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃ ১৯৯

৩। ঐ, পৃ ১৯৮

৪। হিষ্টরী অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ১০৪—১১৬

রাজ্য ও রাজার নাম দুই-ই সূচিত করে। আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা পাল বংশীয় রাজাদেরকে 'পাল' নামে অভিহিত করেন, কারণ ঐ বংশের সকল রাজার নামের শেষে পাল শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক কালে তাঁদেরকে কি নামে অভিহিত করা হত বা তাদের রাজ্যের নাম কি ছিল, তা বলা যায় না। সমসাময়িক শিলালিপিতে 'পাল বংশ' বা 'পাল রাজ্য' এসব উক্তি নাই। বাঙ্গালা নাম—অর্থাৎ যে নামে বিভাগপূর্ব কালের বাংলা প্রদেশ পরিচিত ছিল—প্রচলিত হয় পাল বংশের অনেক পরে, মুসলমান আমলে।[১] বাংলা দেশ তখন গৌড় নামে পরিচিত ছিল এবং শিলালিপিতে রাজাদেরকে গৌড়েশ্বর বলা হত। সুতরাং সমসাময়িক ভৌগোলিকদের বিবরণে রাজার নাম বা গৌড়ের নাম পাওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে হোদিওয়ালার অভিমত-অনুসারে রাজার নাম অর্থাৎ ধর্ম (ملک الدهمی) লিখিত হয়েছে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

আরব ভৌগোলিকদের দ্বিতীয় রকমের তথ্য হচ্ছে, বাণিজ্যপথে সমুদ্র-উপকূলবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের বিবরণ। এঁদের বর্ণিত যে সমস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্রকে বাংলা দেশে অবস্থিত বা বাংলা দেশের আশে পাশে অবস্থিত মনে করা হয়, তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল।[২]

বুলিন থেকে বাবত্তন = ২ দিনের পথ। এখানে চাউল উৎপন্ন হয় এবং সরন্দিবে (সিংহল দ্বীপে) রপ্তানী করা হয়।

বাবত্তন থেকে সিঞ্জিলি এবং কবশকন = ১ দিনের পথ। এখানে চাউল উৎপন্ন হয়।

সিঞ্জিলি ও কবশকন থেকে কুদাফরিদের মোহনা = ৩ ফরসঙ্গ দূরত্ব।

কুদাফরিদ থেকে কইলাকন, লাওয়া এবং কনগজা = ২ দিনের পথ। এখানে চাউল ও গম উৎপন্ন হয়।

কইলাকন, লাওয়া ও কনগজা থেকে সমন্দর = ১০ ফরসঙ্গ দূরত্ব। এখানে কামরুন থেকে নদীপথে ১৫।২০ দিনে চন্দনকাঠ আনা হয়।

১। স্যার যদুনাথ সরকার কোমেমোরেশন ভল্যুম, পৃ ৫০-৫৮

২। এলিয়ট ও ডউসন: প্রাগুক্ত, পৃ ১৬, ৯০; সৈয়দ সোলায়মান নদভী: আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত, পৃ ৫৮

উপরোক্ত তালিকাদৃষ্টে অনেক প্রথিতযশাঃ পণ্ডিতই উল্লেখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, হোদিওয়ালা বলেন, "দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে খুরদাদবার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। মনে হয় তিনি এমন কোন লেখকের বিবরণ নকল করেছেন, যিনি এলোমেলো ভাবে কতকগুলি স্থানের নাম সাজিয়েছেন এবং নিজ কল্পনাবলে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানের উল্লেখিত দূরত্ব এতই ভ্রান্তি-মূলক এবং অন্যান্য বিবরণ এতই খাপছাড়া যে কোন স্থানের নির্দেশনা নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।"[১] বলা বাহুল্য, হোদিওয়ালার এই উক্তি একান্ত যথার্থ। তাঁর এই উক্তি উপেক্ষা করে ডঃ দানী এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন বলে মনে হয় না।[২] তা সত্ত্বেও, একটি মাত্র জায়গা, অর্থাৎ সমন্দরকে বাংলা দেশের কোন এক উপকূলবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। ইব্‌ন খুরদাদবার মতে "কামরুন থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে [অর্থাৎ নদীপথে] ১৫।২০ দিনে মধ্যে নীত হয়।" আল্‌-ইদ্রিসী সমন্দর সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং ধনশালী স্থান; এখানে [ব্যবসা-বাণিজ্যে] অনেক লাভবান হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীতীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত। এখানে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ করে, গম পাওয়া যায়। পনর দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরুত থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদীপথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্ট। এই দেশের [কামরুতের] চন্দনকাঠ উৎকৃষ্টতর এবং এর ঘ্রাণ মনোরম (delicious perfume)। করণ পর্ব্বতমালায় তা জন্মায়। এই শহরের একদিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বসবাস এবং যেখানে সকল দেশের ব্যবসায়ীরা রীতিমত যাতায়াত করে। সিংহল দ্বীপ থেকে তা চারদিনের দূরত্বে অবস্থিত। সমন্দর থেকে উত্তর দিকে সাতদিনের দূরত্বে কাশ্মীর নগরী অবস্থিত। এই নগরী ভারতের সর্বত্র

৩। হোদিওয়ালা: ষ্টাডীজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিষ্টরি, পৃ ১৮

২। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরী কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃ ১৮৯-১৯৮

আদৃত (celebrated) এবং তা কনৌজের রাজার অধীন। কাশ্মীর থেকে কামরুত চার দিনের দূরত্ব এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ প্রায় সাতদিনের দূরত্ব।"[১]

উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকে আল-ইদ্রিসীর ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কামরুত, কামরুন, ও করণ ইত্যাদি কামরূপের বিকৃত পাঠ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাই যদি হয়, কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব ৭ দিন হলে, কাশ্মীর থেকে কামরূপের দূরত্ব ৪ দিনের হতে পারে না। অপর পক্ষে আল-ইদ্রিসীর মতে, কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব ৭ দিন, অথচ, একই লেখকের মতে কাশ্মীর থেকে সমন্দরের দূরত্বও ৭ দিন। তাঁর নিজের বর্ণনামতেই এই দূরত্ব অন্ততঃ ১৪ দিনের হওয়া উচিত ছিল। সিংহল দ্বীপ থেকে সমন্দরের দূরত্বও ৪ দিন হওয়া সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য এই সব ভ্রমাত্মক বর্ণনা হোদিওয়ালার পূর্বোক্ত মতকেই সমর্থন করে। কিন্তু আল-ইদ্রিসীর উদ্ধৃত বিবরণের প্রথম অংশের কামরুত যদি কামরূপের সঙ্গে অভিন্ন হয় (আধুনিক কালের সকল পণ্ডিতই তা স্বীকার করেন) তাহলে সমন্দর বাংলা দেশের উপকূলবর্তী কোন এক বাণিজ্য কেন্দ্রকেই বুঝায়। ডঃ দানী সমন্দরকে মেঘনা নদীর মোহনাস্থিত স্থান মনে করেন এবং সমন্দরের এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত আল-ইদ্রিসী-বর্ণিত দ্বীপকে সন্দীপের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[২] হয়ত তাঁর অনুমান ঠিক, কিন্তু তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে মেজর র‍্যানেলের জরীপের পর বাংলা দেশের নদীসমূহ যেভাবে গতি পরিবর্তন করেছে, তা লক্ষ্য করলে বাংলা দেশের বর্তমান মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে ৮ম।৯ম শতাব্দীর বর্ণিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করা কি বিজ্ঞানসম্মত? সে যা হোক, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ আলোচনা করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলা দেশের সঙ্গে আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাই ব্যবসায়ীদের মারফৎ ভৌগোলিকরা বাংলা দেশ সম্বন্ধে অবহিত হন এবং তাঁদের বর্ণনায় তা লিপিবদ্ধ করেন।

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান রাদজা তয়েং-এ নিম্নরূপ একটি আখ্যান উল্লেখিত আছে। "এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রা-দজা-গ্যীর বংশধর

১। এলিয়ট ও ডউসন: প্রাগুক্ত, পৃ ৯০

২। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরি কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃ ১৯১

মহতইঙ্গৎ চন্দয়ত সিংহাসন আরোহন করেন। ··· এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে তাঁর সময়ে (৭৮৮—৮১০ খৃঃ) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রন্‌বী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠান হয়। সেখানে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।"[১] আরব বণিকরা যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত, এ তার একটি বড় প্রমাণ। আরাকান উপকূলে ব্যবসা চালালে বাংলা দেশ বাদ পড়ে না। এই উপাখ্যানের অন্য জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে যে ৯৫৩ খৃঃ আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ ৎচন্দয়গ 'সুরতন' বিজয়ে বের হন এবং সে দেশে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেওগোং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[২]

অনেকে মনে করেন যে আরাকান রাজের এই চেওগোং উক্তি থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ এই বিবরণের উপর নির্ভর করে কল্পনার জাল বুনেছেন। তাঁরা মনে করেন, 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের আরাকানী সংস্করণ এবং তদনুসারে তাঁরা বলেন যে, চট্টগ্রামে ঐ সময়ে মুসলমানরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।[৩] চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, তা এখন সন্দেহাতীত, কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলা নিছক কল্পনাপ্রসূত। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন', যার অর্থ এখনও নিঃসন্দেহভাবে পরিস্ফুট হয়নি, তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ আরাকান বংশাবলী পড়ে মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' এর সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না; তা অধুনালুপ্ত কোন একটা স্থানের নাম সুচিত করে।

এ ছাড়া, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত কতকগুলি উপাখ্যান রয়েছে। এসব উপাখ্যানমতে কয়েকজন মুসলমান সুফী সাধক তুর্কী

১। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪৪, পৃ ৩৬

২। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪৪; পৃ ৩৬

৩। ডঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম: আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য; পৃ ৩৪

আক্রমণের পূর্বে বাংলা দেশে এসেছিলেন এবং ধর্মপ্রচার করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বাবা আদম শহীদ, শাহ সুলতান রুমী, শাহ সুলতান মাহিসওয়ার, মখদুম শাহ দওলাহ্ শহীদ ইত্যাদির নাম করা যায়। এখানে তাঁদের ঐতিহাসিকতা বিচার করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাবা আদম শহীদ

বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানে, সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী বলে কথিত বল্লাল বাড়ীর অনতিদূরে, সুলতান জলাল-উদ-দীন ফতেহ শাহের সময়কার একটি মসজিদের সামনে বাবা আদম শহীদের কবর দেখা যায়। কথিত আছে যে বাবা আদম যখন মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন, তখন রামপালের অনতিদূরে কানাইচং নামক গ্রামে একজন মুসলমান বাস করতেন। সেই মুসলমান ভদ্রলোক তার ছেলের জন্ম উপলক্ষে গরু জবেহ করলে তথাকার হিন্দুরাজা বল্লাল সেন তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। মুসলমান ভদ্রলোক তখন মক্কা শরীফে গিয়ে এই বৃত্তান্ত জানালে বাবা আদম ৬।৭ হাজার শিষ্য সমভিব্যাহারে বাংলা দেশে আসেন এবং রাজা বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে রাজা জয়লাভ করেন ও বাবা আদম শহীদ হন। কিন্তু ভাগ্যদোষে রাজা তাঁর পরিবারবর্গসহ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন।[১]

বাবা আদমের নামে প্রচলিত কবরের উপর কোন সমাধি-ভবন নাই এবং এছাড়া অন্য কোন অকাট্য প্রমাণও নাই যাতে বলা যায় বাবা আদম শহীদ এখানে সমাধিস্থ আছেন। মসজিদ-গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিমতে মসজিদটি ৮৮৮/১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান জলাল-উদ্দীন ফতেহ শাহের কর্মচারী মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। এই শিলালিপিতেও বাবা আদম শহীদের কোন উল্লেখ নাই। তুর্কী আক্রমণের পূর্বে বাংলার সাথে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ থাকলেও ঐ সময়ে রামপালের মত অন্তর্বর্তী ভূভাগে কোন মুসলমান বসতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন কিনা বলা মুস্কিল। আনন্দভট্টের 'বল্লাল-চরিতে' বাবা আদম

১। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল, খণ্ড ৫৭, পৃ ১২।

(বায়াতুস্ব লিখিত) এবং রাজা বল্লাল সেনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ আছে।[১] আধুনিক পণ্ডিতেরা বল্লাল-চরিতের প্রামাণিকতা সন্দেহ করেন। সে যাই হোক, বল্লাল-চরিতের তারিখ ষোড়শ শতাব্দীর আগে নয়।[২] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে বিক্রমপুরে বল্লাল সেন নামক জনৈক প্রতাপশালী জমিদার বাস করতেন। তাঁর আদেশক্রমেই আনন্দভট্ট বল্লাল-চরিত রচনা করেন।[৩] নগেন্দ্রনাথ বসুর এই উক্তি সত্য হলে বাবা আদম শহীদের সম্বন্ধে প্রচলিত উপাখ্যানের সত্যতার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিক্রমপুরে মুসলমান পরিবার বসবাস করা এবং মুসলমান সুফী সাধকদের পক্ষে প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা অসম্ভব নয়, কারণ ঐ সময়ে বাংলা দেশের আনাচে কানাচে মুসলমান শক্তি আধিপত্য বিস্তার করছিল।[৪]

শাহ সুলতান রূমী

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার মদনপুর নামক স্থানে শাহ সুলতান রূমীর দরগাহ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে ১৮২৯ সালে বৃটিশ সরকার দরগাহ-সংলগ্ন লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চাইলে দরগাহর খাদেম ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের একটি ফার্সী সনদ মারফৎ প্রমাণ করেন যে শাহ সুলতান রূমী ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মদনপুরে আসেন।[৫] সনদ খানা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; ডঃ এনামুল হক—যিনি এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তিনিও—বিশদ আলোচনা করেন নি। এ অবস্থায় এবিষয়ে কোন মন্তব্য করা অসমীচীন। কিন্তু কথিত আছে যে কোন একজন কোচ রাজা

১। আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত, ২৬ ও ২৭শ পরিচ্ছেদ।

২। হিষ্টরি অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, পৃ ২৩৯—৪৯

৩। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৬, পৃ ৩৬—৩৭

৪। আঃ করিম : সোসাল হিষ্টরি অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, পৃ ৩৩—৩৮

৫। ডঃ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ ১৩৮

শাহ সুলতান রূমীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন।[১] এই উক্তি সত্য হলে শাহ সুলতান রূমীর সময় তুর্কী আক্রমণের পূর্বে আরোপ করা যায় না। কোচরা সেন রাজাদের পতনের পরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন।[২] এমন কি, মিনহাজ-উদ-দীন সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরীতেও কোচদেরকে একটি সামান্য পার্বত্য উপজাতি (tribe) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

শাহী সুলতান মাহিসওয়ার

বগুড়া জেলার মহাস্থানে শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের দরগাহ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে তিনি বল্‌খ-এর রাজপুত্র ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু রাজকীয় জাঁকজমকে অতিষ্ঠ হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে সূফীমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরু দামেস্কের শয়খ তওফিক তাঁকে বাংলা দেশে ইসলাম প্রচার করার আদেশ করায় তিনি এদেশে আসেন। তিনি সন্দীপের মধ্য দিয়ে বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরে আসেন এবং সেখানকার কালীপূজক রাজা বলরামকে হত্যা করেন ও মন্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থানে গমন করেন এবং সেখানকার রাজা পরশুরাম ও তাঁর ভগ্নী শিলাদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ফলে রাজা নিহত হন এবং শিলাদেবী করতোয়া নদীতে আত্মহত্যা করেন।[৪] পরশুরামের সঙ্গে শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের বর্ণনা কিংবদন্তীতে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাঁকে মাহিসওয়ার বলার কারণ, কিংবদন্তীমতে, তিনি মাছের আকৃতিবিশিষ্ট জাহাজে চড়ে বাংলা দেশে আসেন।

শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের কাল নির্ণয় করার মত কোন সূত্র এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু লোকে আজ পর্যন্ত তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ সুফী হিসাবে গণ্য করে থাকে। ১৬৮৫ সালে মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে সৈয়দ আবদুর

১। বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : ময়মনসিংহ, পৃ ১৫২

২। ই, এ, গেট : হিষ্টরি অব আসাম, পৃ ৪৬

৩। মিনহাজ : তবকাত-ই-নাসিরী, মূল ফার্সী, লাহোর সংস্করণ, পৃ ৬৪

৪। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৫, পৃ ১৮৩-১৮৬

রহমান ও সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাকে প্রদত্ত সনদে শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের দরগাহ-সংলগ্ন লাখেরাজ ভূসম্পত্তি তাঁদের নামে বহাল করেন। এই সনদ খানি কোকলতাশ মোজাফ্‌ফর জঙ্গের মোহরাঙ্কিত এবং এতে সিলবারী পরগণার মোতসদ্দি, চৌধুরী ও কানুনগো ইত্যাদি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের লাখেরাজ জমির ক্ষতিসাধন না করে।[১] উপরোক্ত সনদ খানিতে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রদত্ত ফরমান ও সনদের উল্লেখ আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সব ফরমান ও সনদের হদিস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং শাহ সুলতান মাহিসওয়ারের প্রকৃত কাল নির্ণয় করা বা তাঁর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা বর্তমানে সম্ভব নয়।

মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদের মাজার দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তীমতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)র সমসাময়িক মোয়ায্‌ বিন্‌ জবলের ইচ্ছানুসারে এবং অনেক শিষ্য সমভিব্যাহারে তিনি ইয়মন থেকে বাংলা দেশে ধর্মপ্রচার, করতে আসেন। পথে তিনি শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সাক্ষাৎ পান, যিনি তাঁকে দুটী পায়রা উপহার দেন। তাঁদের জাহাজ পূর্বদিকে চলতে থাকে এবং অবশেষে শাহজাদপুরে এসে মাটীতে ঠেকে। এদেশের রাজার তখন বিহার পর্যন্ত কর্তৃত্ব ছিল। রাজা বিদেশাগতদের বাধা দেন; ফলে শিষ্য সমভিব্যাহারে মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ প্রাণ ত্যাগ করেন।[২]

এই সুফীর কাল নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিংবদন্তীতে মোয়ায বিন জবল ও শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে; তাঁদের সময়ে প্রায় ৬০০ বৎসরের ব্যবধান। একথা জোর করে বলা যায় যে, মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ মোয়ায বিন জবলের সমকালীন ছিলেন না। শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সময় ১১৯২-১২৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরা যায়।[৩] সুতরাং মখদুম শাহ দৌলাহ যদি শয়খ জলাল-উদ্‌-দীন বোখারীর সমকালীনও হন,

---

১। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৮, পৃ ৯২-৯৩

২। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯০৪, পৃ ২৬২-৭১

৩। জন, এ, সোবহান : সুফীজম, ইটস্‌ সেইন্টস এণ্ড শ্রাইনস, পৃ ২৩৬

তাহলেও বলতে হয় যে, মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পরে বাংলা দেশে আসেন। মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদের দরগাহ-সংলগ্ন মসজিদ ৭২২ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক।

ডঃ এনামুল হক একটি কিংবদন্তী অবলম্বনে বলেন যে, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী সমাধিস্থ আছেন। সাধারণ লোকে তাঁকে রাহাপীর বলে। তিনি মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রম কেশরীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।[১] এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামে বায়েজীদ বোস্তামীর নামে প্রচলিত একটি দরগাহ আছে, যদিও তিনি কোন দিন চট্টগ্রামে তথা পাক-ভারতে এসেছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। 'সেক শুভোদয়া' নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শয়খ জলাল উদ্-দীন তবরিজী বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বে রাজা লক্ষ্মণ সেনের দরবারে এসেছিলেন এবং আসন্ন তুর্কী আক্রমণের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[২] এই বই লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ মিশ্রের নামে আরোপিত হলেও আধুনিক গবেষকরা এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবং এটা জাল ঘোষিত হয়েছে।[৩] তাছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে শয়খ জলাল উদ্-দীন তবরিজীর সময় নিরূপণ করা যায়, তাতে মনে হয় তিনি তুর্কীদের বাংলা আক্রমণের পরে বাংলা দেশে এসেছিলেন।[৪] উপরের আলোচনায় এ কথাই পরিস্ফুট হচ্ছে যে তুর্কী আক্রমণের পূর্বে কোন মুসলমান সূফী বা ধর্ম-প্রচারক নিছক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে আগমন করেছিলেন কিনা, তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

তুর্কী আক্রমণের পূর্বে চট্টগ্রামে আরবীয় মুসলমানরা যে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এর সপক্ষে অভিমত দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ কেউ কেউ 'মকতুল হোসাইন'-প্রণেতা সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বংশ-তালিকা উল্লেখ করেন। কবি মোহাম্মদ খান আরব দেশ থেকে আগত কোন এক মাহি আছোয়ারকে তাঁর ঊর্ধতন পূর্বপুরুষ বলে দাবী করেন। মোহাম্মদ

১। এনামুল হক: বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ ১২৯

২। সুকুমার সেন সম্পাদিত, সেক শুভোদয়া, পৃ ১১, ৯৮-১১৩

৩। আবিদ আলী ও ষ্ট্যাপল্টন: মেময়রস অব গৌড় এণ্ড পাণ্ডুয়া, পৃ ১০৫-১০৬

৪। আঃ করিম: সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, পৃ ৯৫

খানের সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, তবে তাঁর বংশ-পরিচয়ের সারমর্ম নিম্নরূপ :—

কবির পিতামহ মাহি আছোয়ার আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশে তাঁর জন্ম ; এছাড়া তিনি হযরত ওমর, ওসমান, আলী, হামজা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। হাজী খলিল পীর নামক এক ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক হলে তিনি মাহি আছোয়ারকে সঙ্গে নেন। হাজী খলিল পীর সিংহচর্ম পরিধান করেন এবং উভয়ে মৎস্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করে (মৎস্যাকৃতি বিশিষ্ট ভেলা ?) সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছেন। চট্টগ্রাম পৌঁছলে কদল খান গাজী ও বদর আলাম তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সেখানে মাহি আছোয়ার এক ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর মাহি আছোয়ার দেশে ফিরে যান, কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যার ঔরসজাত তাঁর সন্তান-সন্ততি এদেশেই থেকে যান। অতঃপর মাহি আছোয়ারের বংশধরদের নাম দেওয়া হয়েছে, তা এই :—

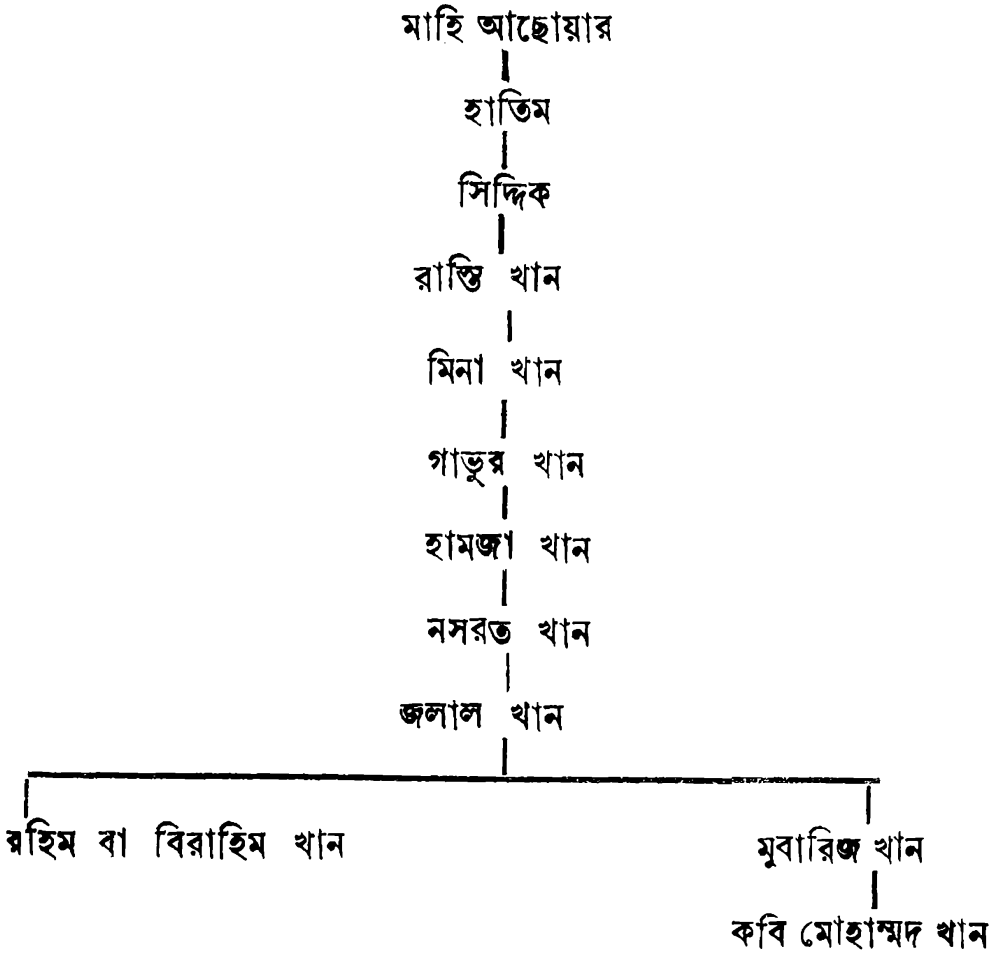

১। সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১০১-১০৫

এখানে মাহি আছোয়ারের সমসাময়িক হিসাবে আরও তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে—হাজী খলিল পীর, কদল খান গাজী ও বদর আলাম। মাহি আছোয়ার ও হাজী খলিল পীর দুজনেই এক সঙ্গে আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং অপর দুই ব্যক্তি কদল খান গাজী ও বদর আলাম তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। হাজী খলিলকে পীর বলা হলেও তাঁর পীরত্বের বিশেষ বর্ণনা নাই। তাঁর সিংহচর্ম পরিধান করার কাহিনী এবং মৎস্যপৃষ্ঠে অরোহণ করা অলৌকিক কাহিনীর মত শুনালেও হয়ত সিংহচর্ম এখানে একটা বিশেষ রকমের কাপড় বোঝায় এবং মৎস্য, মৎস্যাকৃতি-নৌকেই বোঝায়। অলৌকিকতা বাদ দিলে সাদামাটা কথায় যা বোঝা যায়, তা হচ্ছে, মাহি আছোয়ার ও হাজী খলিল পীর দুইজনেই বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসেন। কবির এই বর্ণনার আর একটী সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, সেকালের যেসব আরবীয় মুসলমানরা এদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসতেন, তাঁদের কেউ কেউ এদেশে বসবাস করতেন এবং এমন কি, এদেশীয় মেয়েদের পাণিগ্রহণ করতেন।

অপর যে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, তাঁদের সাহায্যে মাহি আছোয়ারের সম্ভাব্য কাল নির্ণয় করা যায়। বদর আলাম সুবিখ্যাত পীর বদর-উদ-দন বদর-ই-আলমের (মৃত্যু ১৪৪০ খৃঃ) সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়। অবশ্য নামের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্তু যাদ আমাদের এই অনুমান সত্য হয়, তাহলে, মাহি আছোয়ারের তারিখ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম অর্ধেকে পড়ে। কদল খান গাজীর নাম অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। শিহাব-উদ-দীন তালিশের মতে সোনারগাঁয়ের সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮—১৩৪৯ খৃঃ) সবার আগে চট্টগ্রাম জয় করেন। কেউ কেউ পীর বদর-ই-আলম ও সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহকে সমসাময়িক মনে করেন এবং এই সূত্রে মোহাম্মদ খান-বর্ণিত কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীনের চট্টগ্রাম-বিজয়ী সেনাপতি বলে মনে করেন।[২] এঁদের মতে পীর বদর-ই-আলমের মৃত্যু তারিখ ১৩৪০

১। যদুনাথ সরকার : ষ্টাডিজ ইন মুঘল ইন্ডিয়া, পৃ ১২২

২। সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১০৬

খৃষ্টাব্দ। সম্প্রতি সিদ্দিক খান সাহেব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১] মনে হয়, পীর বদর-ই-আলমের মৃত্যু তারিখ ১৪৪০ সালের পূর্বে আনার পক্ষে বিশেষ যুক্তি নাই। যদি তাই হয়, কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সমসাময়িক মনে করা ভুল। শিহাব-উদ-দীন তালিশ যেমন ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহকে প্রথম চট্টগ্রাম-বিজয়ী বলেছেন, জনশ্রুতিমতেও[২] কদল খান গাজীকে প্রথম চট্টল-বিজেতা বলা যায়! এ ছাড়া দুজনকে সমসাময়িক মনে করার অন্য কোন প্রমাণ নাই। ইব্‌ন-বতুতা-বর্ণিত সোদকাওয়ান যদি চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন হয়,[৩] তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চট্টগ্রাম ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু ইব্‌ন বতুতার বর্ণনায় চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হিসাবে শয়দা নামক এক ফকীরের নাম পাওয়া যায়। কদল খান গাজীর কোন নাম নাই। সুতরাং শুধু দুটী সূত্রের সমন্বয় সাধনের জন্য এবং জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কদল খান গাজীকে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সমসাময়িক গণ্য করা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়।

অন্যভাবেও মাহি আছোয়ারের সময় নিরূপণ করার চেষ্টা করা যায়। মোহাম্মদ খানের বর্ণনায় মাহি আছোয়ারের দুই পুরুষ পরে এক রাস্তি খানের নাম আছে এবং তাঁকে চট্টগ্রামের অধিপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত সুলতান রুকন-উদ্‌-দীন বারবক শাহের সময়কালীন এক শিলালিপিতেও এক রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায় এবং তাঁকে মজলিশ-ই-আলা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৪৭৪ সালে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি প্রমাণ করে যে ঐ সময় রাস্তি খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন।[৪] আধুনিক পণ্ডিতরা এই দুই রাস্তি খানকে অভিন্ন মনে করেন।[৫] কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে মাহি আছোয়ারের সময় পঞ্চদশ

১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটী অব পাকিস্তান খণ্ড ৭, ১ম ভাগ, পৃ ১৭-৪৬

২। সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১০৬

৩। অনেকেই তা মনে করেন, যেমন, এন, কে, ভট্টশালী : কয়েনস এণ্ড ক্রনোলজী অব দি আর্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সুলতানস্‌ অব বেঙ্গল, পৃ ১৪৫-৪৯

৪। শামস্‌দ্দীন আহমদ : ইনস্‌ক্রিপনস্‌ অব বেঙ্গল, খণ্ড ৪, পৃ ৯১

৫। প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিষ্ট্‌রী কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃ ১০১-১০২ ; এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৮২।

শতাব্দীর প্রথম দিকেই পড়ে। আধুনিক পণ্ডিতেরা একদিকে যেমন দুই রাস্তি খানকে অভিন্ন মনে করেন, তেমনি মাহি আছোয়ার, কদল খান গাজী ও ফখর-উদ্-দীন মুবারক শাহকে সমসাময়িক গণ্য করেন, কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন নি যে, এই সমসাময়িকতা প্রমাণের জন্য তাঁরা মাত্র দুই পুরুষ ব্যবধানের জন্য প্রায় দেড় শত বৎসরের কাছাকাছি সময় দিয়েছেন, যা কোন মতেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। এই সমসাময়িকতার উপর জোর দিলে বলতে হবে যে, মোহাম্মদ খানের বংশ-তালিকা নির্ভুল নয়। কিন্তু তাঁরা এমন কোন মতও প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক পণ্ডিতদের সমস্ত অনুমান বা সিদ্ধান্তগুলিই শুধু নামের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন, কদল খান গাজী যদি ফখর-উদ্-দীন মুবারক শাহের চট্টগ্রাম-বিজয়ী সেনাপতি হন, বা বদর আলম যদি সুপ্রসিদ্ধ পীর বদর-ই-আলমের সঙ্গে অভিন্ন হন, বা দুই রাস্তি খান যদি এক ও অভিন্ন হন ইত্যাদি। এই 'যদি'গুলির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অনুমান বা সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করার পক্ষে বাধা থেকে যায়। কিন্তু যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, মাহি আছোয়ারের তারিখ চতুর্দশ শতকের পূর্বে নিরূপণ করা যায় না, তুর্কী আক্রমণের আগে ত নয়ই।

আরাকান উপকূলে "বদর মোকাম" বা "বুদ্ধের মোকাম" নামধারী কতকগুলি স্থাপত্য নিদর্শন অদ্যাবধি দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এগুলিকে খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমান প্রভাবের ফল আখ্যা দিয়েছেন। যেমন ডঃ এনামুল হক ও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, "এই সময় হইতেই [খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী] আসামের সীমা হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে "বুদ্ধের মোকাম" নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ, চীনা ও মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।"[১] সম্প্রতি সিদ্দিক খান সাহেব, 'বদর মোকাম' সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ও এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন।[২] এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে

১। এনামুল হক ও আবদুল করিম: আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ৩

২। জার্ন্যাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটী অব পাকিস্তান, খণ্ড ৭, নং ১, পৃ ১৭-৪৬

নিষ্প্রয়োজন; সিদ্দিক খান সাহেব দেখিয়েছেন যে, এই 'বদর মোকাম'গুলি পীর বদর-ই-আলম বা বদর শাহের স্মৃতি বহন করে, যিনি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেছেন এবং বিহারের 'ছোট দরগাহে' সমাহিত আছেন। বস্তুতঃ এ গুলিকে খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে আরোপ করার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

উপরোক্ত আলোচনায় মনে হয়, বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের আগে বাংলা দেশের সঙ্গে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল; এ যোগাযোগ ছিল নিছক বাণিজ্যের খাতিরেই, এর ফলে বাংলা দেশে মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল বলার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। হয়ত কোন কোন বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে এদেশে এসে দেশীয় নারীর পাণিগ্রহণ করতেন। কিন্তু তাও জোর করে বলার পক্ষে কোন প্রমাণ আধুনিক পণ্ডিতদের হস্তগত হয় নি। সুফী সাধকদের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। তুর্কী আক্রমণের পূর্বে বাংলা দেশে কোন মুসলমান সুফী এসেছিলেন কিনা, তার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শুধু এ কথাই জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলা দেশের সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল শুধু ব্যবসার মাধ্যমেই।